প্রথম প্রকাশ—

১৫ই কার্তিক ১৩৬৭

কালীপূজার রাত্রি।

প্রকাশক—

সলিল রুদ্র।

৩।এ, বিডন স্কোয়ার, কলি-৬।

মুদ্রাকর—

"মিতালী"

১৭০, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬

বাঁধিয়েছেন—

মিতালী বাইণ্ডিং কর্ণার

১৭০, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬

প্রাপ্তিস্থান—

১। সলিল সাহিত্য প্রকাশনী

৩।এ, বিডন স্কোয়ার,

কলিকাতা-৬

২। স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোং

১০।এ, জি টি রোড,

হাওড়া-১।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য ও ভাবীকাল সাহিত্যবাসর

কর্তৃক 'জ্ঞানভিক্ষু' উপাধি প্রাপ্ত লেখক

সমীরণ রুদ্রের কয়েকখানি বই—

১।	চার চোখের ভাষা···	(উপন্যাস)	৪-০০
২।	মহামানবের সাগর তীরে···	(প্রবন্ধ সংকলন)	৪-০০
৩।	অনেক সন্ধ্যা একটি সন্ধ্যাতারা···	(কবিতা সংকলন)	২-০০
৪।	বসন্ত তিলক···	(গল্প সংকলন ১ম ভাগ)	৫-০০
৫।	আলোর ঠিকানা···	(গল্প সংকলন ২য় ভাগ)	৭-০০
৬।	কুর্চিফুলের অর্ঘ্য ডালা···	(কবিতা সংকলন ২য় ভাগ)	৩-০০

'সন্দীপন' পত্রিকার গোষ্ঠি কর্তৃক

আয়োজিত সারা বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে

লেখককে এ-বছরের শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসাবে

সম্মান পত্র দেওয়া হয়েছে।

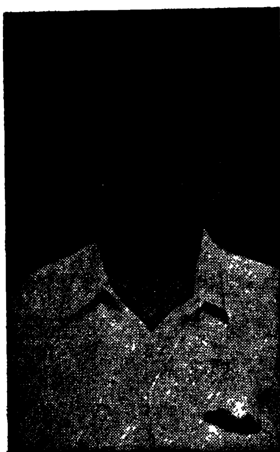
উৎসর্গ আমার স্বর্গীয়া স্ত্রী অমিতা রুদ্রকে

তোমায় এমনি করে হারাই একদিন

অমিতা সেদিন হঠাৎ কাল বৈশাখীর ঝড় উঠেছিল,
সেই ঝড়ে তুমি ঝরে গেলে সঙ্গোপনে, তার আগে—
আমি রোজ রাত্রে কিছু নক্ষত্রকে নামতে দেখেছিলুম
তোমার দুচোখে, ভেবেছিলুম তুমি নিঃসঙ্গ রক্তের
বুঝি কোন উদাসীন শ্লোক, তাই তুমি যেদিন চলে গেলে সেদিন প্রথাসিদ্ধ,
লোক দেখানো আমি হা হুতাশ করিনি। আমার চোখের জল
সেদিন শুকিয়ে গেছল। জানো অমিতা আমার চোখের
জল প্রথম ঝরেছিল আমার মায়ের অস্থির ওপরে।
শেষবার আমার পিতার প্রাচীন অস্থির ওপরে।
পিতার অগ্নি পরীক্ষিত ওই অসমাপ্ত হাড় যেন নিষ্পলক
চেয়েছিল নিঃস্ব রিক্ত এক প্রতিবিম্বের দিকে।
সে কে? সে কি আমি নই? আমি যে তাঁদের প্রথম সন্তান।
তিনি আমার দুঃখ বুঝেছিলেন। বুঝে ব্যথা পেয়েছিলেন।
তারপর অনেক আত্মীয় গাছ, অভিভাবক নদী হারিয়ে গেল একে একে,
নগ্ন পায়ে রাত্রি নেমে এল। অরণ্যে ঘন মেঘ ঘনালো।
মনে হল এখানে কেউ কি চিরস্থায়ী থাকে? মনে হল কেউ কি ছিল?
মনে হল কেউ কি কোথাও আছে?

না সব ফাঁকা, মায়া, মিথ্যা স্বপ্ন।
কেউ এখানে চিরদিন থাকবে না। কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না।
তবু তুমি ছিলে আমার জীবনের শুরু,
আমি জানি না যন্ত্রনার কি শ্লোগান গেয়ে
তুমি চলে গেলে, তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারিনি।
কাকেও না। কেউ পারে না তা।
অমিতা সর্বস্ব আমার, এখন হাট শেষে
ধীরে ধীরে থেমে আসছে আলো হাসি গান।
পরিশ্রান্ত দিনের সীমান্তে তোমার কাছে ফিরে
যাবার সময় কি হয়ে এসেছে এবার?

সমীরণ রুদ্র।



লেখকের নিবেদন

আধুনিক কবিতার মূল্যায়ন করা সহজ নয়।

আধুনিক কবিতার কথা কি বলবো? কবিতা কি?

কবিতা অনেক রকম। এর আবছা উত্তর দেওয়া যায় না।

আপনারা জানেন কবিতা ভালবাসার মতো। ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণে, তর্কে বিতর্কে তাকে বোঝানো যায় না। যে অন্তরে তার স্বাদ পেয়েছে, সে মজেছে। যে পায়নি, সে সহজকে জটিল করে তোলে।

আজকাল কত জ্ঞান, কত ব্যাখ্যা, কত পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা। কারও মত: কবিতার কোনো অর্থ থাকবেনা, সে হবে শুধু ধ্বনির মালা। কেউ বলেন: অবচেতন মনের উদ্ভূত খেয়ালগুলি উঠে আসবে কবিতায়। কারও বিশ্বাস: সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়, জীবন-দর্শনের অভিব্যক্তি চাই তাতে। কারও উক্তি: ভাববিলাসের দিন চলে গেছে, নয়া জমানা পয়দা করাই একালের কবিতার উদ্দেশ্য। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন—'Poetry is the spontaneous overflow of feelings.' ওয়ার্ডসওয়ার্থের এ সংজ্ঞা সর্বকালের কবিতা সম্পর্কে যতই প্রযোজ্য হোক না কেন, এ কালের শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক এলিয়ট কিন্তু একে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে 'Poetry is a superior amusement.' আমার মনে হয় এ দু'টি মতের মধ্যেই সত্য রয়েছে। আমি মনে করি কবিতা শুধু ছন্দের

ঝঙ্কার নয়, কিংবা শুধু শব্দ প্রয়োগের কারুকলাও নয়। কবিতা মহৎ ভাবের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। আপনারাও হয়তো আমার এ মত মেনে নেবেন।

এ প্রসঙ্গে মানুষেরকবি ও গণ চেতনার কবি, হুইটম্যানের একটি কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। তিনি বলেছেন :

'I know I am solid and sound,

I know I am deathless.' হুইটম্যান সত্যই অমর।

উনি বলেছেন 'আমি কবি। আমি পূর্ণ, আমি মৃত্যুহীন।' দেখুন এযে একেবারে আমাদের গীতা-উপনিশদেরই প্রতিধ্বনি। এমনি করেই এক কালের ও এক দেশের কবিতা সর্বকালীন ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথও অমর। ওঁদের কবিতা সর্বজনীন। তাহলে বলুন শিল্পী মাত্রই মৃত্যুহীন।

কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন অলঙ্কারিকেরা বলেছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্,' অর্থাৎ কাব্য বলতে সেই বস্তুকে বুঝতে হবে যার আত্মা হল রস। তাই কাব্য বা কবিতা সৃষ্টির মূল লক্ষ্য হল রসসৃষ্টি। রস হল এক অনির্বাচনীয় আনন্দোপলব্ধি। কবিকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য, রস সৃষ্টির জন্য, সুন্দর অলংকরণযুক্ত ভাষার সৃষ্টি করতে হয়।

তবু প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে আকাশে মেঘের রং বদল হয়। সেরূপ যুগে যুগে কবিদের মনের ভাব ভাষা ও রূপের পরিবর্তন ঘটে। সাহিত্য হচ্ছে মানব জীবনের প্রতিফলন। তাই কবি বা সাহিত্যিক যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন না। এখানে দেখবেন দুর্বোধ্যতার পথ আমি কিন্তু পরিহার করেছি আমার কবিতায় সর্বত্র।

সাহিত্য এমন একটি শিল্পসৃষ্টি যা প্রতিনিয়ত সব কিছুকে পুরানো করে দিয়ে নতুনের দিকে এগোতে চায়, সঙ্গে রাখে গুটিকয়েক সৃষ্টি যাকে আমরা শাশ্বত নাম দিতে চাই। আজকের পাঠক মনে হয় কবিতার প্রতি কিছুটা অমনোযোগী। পাঠক ও কবির মধ্যে সম্পর্কের কোথায় যেন ছেদ পড়েছে। কে দোষী? কবি? না পাঠক? না সময়? আমি ঠিক জানি না। সুতরাং সব দেখে যাওয়াই ভাল। মেনে নেওয়াই ভাল। যুগ সত্যিই পালটেছে। যুগ পালটাচ্ছে। বিচারের বাণী পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। এইখানেই শেষ করছি আমার কথা।

বিনীত—কবি

সমীরণ রুদ্র।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার এবং

মানুষ শ্রীসমীরণ রুদ্রকে

ভাবীকাল সাহিত্য বাসর থেকে

"জ্ঞানভিক্ষু ও সাহিত্য সাধক"

সম্মানসূচক

উপাধি দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয় দপ্তর—ভাবীকাল

বাংলা ১৩২২ সালে, ২৩শে শ্রাবণ, সাহিত্যিক শ্রীসমীরণ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন—মাতুলালয়ে মধ্যহিংলী গ্রামে। আদি নিবাস ইড়পালা গ্রাম—মেদিনীপুরে। ওঁরা সাত ভাই—দুই বোন। বোন দুটি অল্প বয়সেই সংসার ছেড়ে চিরতরে চলে যান। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুল হ'তে ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে। স্কটিশে আই-এ পড়েন, বি-এ পড়তে বিদ্যাসাগর কলেজে যোগ দেন। সেখানে বিশ্বকোষ রচয়িতা অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আনুকূল্যে সাহিত্যে অনুরাগ জন্মে। ছেলেবেলা থেকেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগদেন। লেখা শুরু হয় ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায়। ক্রমে কলকাতা ও মফস্বলের ও ঢাকার নানা কাগজে কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোট গল্প অজস্র লিখেছেন। লেখকের কবিতার বাছাই করা লেখার সংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থ সমালোচকের হাতে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। ২ খানি গল্প সংকলনের বইও প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিও উচ্চ প্রশংসিত। বর্তমানে তিনি কবিতা সংকলন ২য় খণ্ড প্রকাশ নিয়ে ব্যস্ত। দীর্ঘদিন বিপত্নীক, একমাত্র ছেলে অবিবাহিত। দুটি মেয়ে—

ওঁদের ভাল ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে। দুর্বল মানুষ—বর্তমানে রোগজীর্ণ—গৃহবন্দী। কোন সভা-সমিতিতে যেতে পারেন না। বন্ধুবান্ধব সবাই বাড়িতেই দেখা করতে আসেন। সদাহাস্য মুখ—প্রসন্ন মনের মানুষ। প্রকৃত বন্ধু-বৎসল। প্রার্থনা শ্রীভগবানের চরণে—এই জীবনে তিনি যে জন্মান্তর ভাল করেছেন—তাতে তাঁর পূর্ণ সিদ্ধি আসুক। তিনি বলেন আমাদের অনেক কথাই তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে—একটু নমুনা তুলে দিলাম পাঠকদের কাছে—

'এভাবেই একদিন ফল, ফুল আর আকাশে
নিজেকে রেখে আমি চলে যাব,
তারপর আমার পৌত্র, বা দৌহিত্র একদিন সে ফল
পৌঁছে দেবে সূর্যের দুয়ারে ;
তুমি বীজ বপনের ভরসায় থেকো না,
জেনো, সময় না হলে অঙ্কুরের জন্ম সম্ভব নয়।
এই আকাশে রেখে যাব এক-বুক ভালবাসা,
আমার হতভাগ্য সন্তান হয়তো এখানেই খুঁজে পাবে
অমৃতের সন্ধান।'

তাঁর এখনো অবিবাহিত ছেলের জন্য তাঁর মনের কোনায় অসীম বেদনা বোধ আছে। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী। সাহিত্য চর্চা নিয়েই থাকেন। লেখা আর বই পড়া এই তাঁর জীবনের আনন্দ। ফুল ও গান ভালবাসেন। ভ্রমণ ভালবাসতেন কিন্তু এখন পঙ্গু হয়ে গিয়ে আর কোথাও যেতে পারেন না।

দু-কথায়

চলতি রীতিতে মুখবন্ধে সমালোচনা মূলক নিবেদনের সার্থকতা খুব নেই। কবিতার জন্ম অনুভূতিতে। সুখদুঃখ, আশা আনন্দ হৃদয়েই আলোড়ন সৃষ্টি করে; কার্যকরী প্রণয়ে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠা সমমানে ঠাঁই রচনা প্রতি পর্যায়ে। দ্রষ্টার দর্শন যত নিবিড় ও নিকটতম, প্রকাশ ততটা তাত্বিক ভঙ্গিমা ছেড়ে শাশ্বতের সান্নিধ্য নেবেই। অতিন্দ্রিয় অধরাকে আপ্লুত করবে আনন্দের ফলিত আঙ্গিকে। নিটোল একটি চিত্র, বক্তব্যের আক্ষরিক কলেবরে যদি আত্মীয়ের মত অধরকে টানতে পারে সামান্য তবেই তো তার চরম সার্থকতা। এতে জাতি ধর্ম সমাজ সংস্কার নেই। মানুষ জন্মই দুর্লভ—এই জন্মে আবার কবি দৃষ্টির উদয় সাক্ষাত ভগবানের সামীক্য বই নয়। ঝর্ণার অবারিত গতি। সাগরের চিরন্তন উদ্দাম আর কবি মানসের নিত্য নতুনের সান্নিধ্যে কলমুখর সান্নিধ্য প্রায় এক। তাই মনেহয় কস্তুরি মৃগের মত কাব্য কবিকে খাটিয়ে নেয়—জন্মে জন্মান্তরে সেই স্বেচ্ছা বিনোদনই সুর সংলাপ। মানসীকে রক্ত মাংসহীন বিমূর্ত একটি দ্যোতনায় করে রূপায়িত। আশ্চর্য নয়ন বিভোর এ উদয়—এইত মেঘদূত। জীবনে জীবনে রাখে নতুন খবর। খোঁজে প্রেমের চিকুন বুনুনিতে নন্দনকানন। যে হৃদয় একক ছেড়ে আপনাকে বিশ্বহৃদয়ে মিলতে পারে—সেই সঙ্গী নিঃসঙ্গের চরনে ঝাঁপ খেয়ে, ডুব দিয়ে তুলে আনতে পারে সমগ্রের শুভ মাঙ্গল্য। রসোত্তীর্ণ এ সৃষ্টি ও দৃষ্টি রসভারে পায় বিশ্বজীবনের সামীক্য। সহৃদয় পাঠক এই নীরিখে কাব্যখানিকে কোথা স্থান দেবেন সেটা তাঁদের ভাবসৌম্যের উপরেই নির্ভর নেবে। তবে এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে যে শব্দ-ছন্দ চিত্রকল্প ও বিষয় ভাবনার অঙ্গীকার রেখেছিলেন, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে তিনি তা থেকে আরও পরিণত প্রতিশ্রুতির পরিচয় রেখেছেন। সব কবিতাগুলিই রসোত্তীর্ণ। অত্যন্ত সংযত, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান ও অনুভূতি প্রবণ এই কবির কবিতাগুলি আমাদের তৃপ্ত করেছে, মুগ্ধ করেছে। তাঁর যাত্রা জয়যুক্ত হোক।

বিনীত—সুধাংশু গুপ্ত
বি,এ, পি. জি, ডি, এম্ (আমেরিকা)
সম্পাদক—ভাবীকাল

সমালোচকের দৃষ্টিতে

সমীরণ রুদ্রের কোনো বই পাঠক মহলে প্রত্যাঘাত হয়নি। খুব সংযত কলমে এবং সুদক্ষ ভঙ্গিতে তিনি "আলোর ঠিকানার" গল্পগুলি লিখেছেন এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে সমীরণ বাবুর ভাষা সব সময় খুব ছিমছাম, বর্ণনাও বেশ জোরালো। গল্পে সহজেই তিনি পরিবেশ তৈরী করতে পারেন, এবং গল্প বলিয়ে রূপে তাঁর সার্থকতাও প্রশ্নাতীত।

সমীরণ রুদ্র বয়সে প্রবীন ও একাধারে গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রাবন্ধিক। "আলোর ঠিকানা" তাঁর ২য় গল্প সংকলন। নানা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ১৯টি গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত। তাঁর রচনাশৈলী সাবলীল, দৃষ্টি নির্মোহ, কাহিনী কথনেও মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রিয় সমীরণ বাবু, আপনার বইগুলির সম্বন্ধে—আমাদের লাইব্রেরীর পাঠকদের মতামত জানাচ্ছি—আপনার প্রবন্ধগুলি Highly Informative, আপনার কবিতাগুলি পড়তে আনন্দদায়ক। আপনার উপন্যাসটি মিষ্টিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। আর আপনার ছোট গল্পগুলি সেইরকমই মিষ্টি ও মনকে স্পর্শ করে। লেখক, কবি ও প্রবন্ধকার হিসাবে আপনি সত্যই প্রশংসার দাবী রাখেন।

প্রিয়বরেষু, পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে আপনার বইগুলি পড়ার চাহিদা আছে।

কবিতার সূচীপত্র

কবিতার সূচীপত্র

কবিতার সূচীপত্র

কোনো এক অনিন্দিতাকে

তোমার চোখের পাতায় ছিল একঘর স্বপ্ন,
তোমার ঠোঁটের বাঁকে ছিল মিষ্টি হাসি,
এই নিয়েই ছিল আমার মৌরীর বাগান আর বকুল বাসর।
মনে ছিল সবুজ বনের তৃষ্ণা,
নদী নৌকা আর সোনালী রোদ।
কিন্তু দেবদারু বনে সন্ধ্যা নেমে এলে
হঠাৎ ঘুণ পোকা তোমায় করল আক্রমণ।
তুমি দিনে দিনে শুকিয়ে গেলে।
তারপর একদিন--
একদিন শত্রুর ছুরির ফলা তোমার বুকের উষ্ণ পেলবতাকে
কেটে খান খান করে দিলে,
হায় হায় তিলে তিলে
তুমি নিজেকে সরিয়ে নিলে সমুদ্র অতলে
অথবা দ্বিতীয় কোনো আলোর বৃত্তে। আমি ঠিক জানি না।
এখন শূন্যতায় আমার দীর্ণ বুক জ্বলে।
আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে ?
দুর্বাশার এই ক্রুদ্ধ শহরে
আমি বৃথাই খুঁজি আজ প্রেমের আকাশ।
আমার প্রাণ শুধু খোঁজে সূর্যের ইশারা
কোনো পদ্মের ওপর।
সে পদ্ম কি তুমি, গৌরী দীপশিখা ?
বলো কে সে অনিন্দিতা ?

কুর্চিফুলের অর্ঘ্য ডালা

কুর্চিফুলের অর্ঘ্য ডালা অঞ্জলি ভরে দেবো বলে
তাই রয়েছি বসে কতোকাল
আমার বাগানে শিউলি ফুলের রাশ রেখে তাল—
ঘাসে ঘাসে মুক্তা ছড়ায়। ঘুরে বেড়ায
রঙিন প্রজাপতিরা ডানা মেলে।
তখন আমার চোখে স্বপ্ন আনে রজনীগন্ধার ফুল।
স্বপ্ন আনে সবে ফোটা ভীরু যূথিকা, বেল ফুল,
ঐ যে ঝরা বকুলের গন্ধে, বনপথ হয়েছে আকুল,
কুঁচবরণ কন্যা গো, তোমার মেঘবরণ চুল,
বলো এ সবই কি ভুল?
বনরেখা আঁকা মাঠে তুলো-মেঘ জমায় আসর—
দুলে ওঠে কাশের মঞ্জরী
মৌমাছি খুঁজে ফেরে তোমার কবরী।
স্বপ্নসঙ্গিনী গো মালতীমালার গন্ধে—
আজ বাতাস হয়েছে মন্থর,
সেই বাতাসের গুঞ্জনে তুমি শোনোনি কি আমার কণ্ঠস্বর?
আজি রূপো ঝরা সাদা জোছনায় উতলা হয়েছে রজনী,
নিঠুর দয়িতা গো, তুমি কান পেতে শোনোনি কি
আমার ব্যাকুল ব্যগ্র পদধ্বনি?
সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী।

সবুজের গান

জীবন-নদীর স্রোতে স্রোতে আরো আছে গান।
জীবনের গান। সবুজের গান।
স্রোতের বাঁকে বাঁকে নানা রঙ নানা বঙ্গ,
সুখ আর দুঃখ, চির পুরাতন।
মাঠ ভরা হেমন্তের মুখ, ভাদ্রের ভরা নদী,
অথবা যৌবনবতী নারী, ফাল্গুনে বনে বনে
পলাশে শিমূলে বর্ণের সমারোহ—দাগ কেটেছে মনে,
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি এই সব, এই সব জীবনের রঙ
জীবনের সঙ।
জানি না এই দেখে যাওয়ায় কার দেনা শোধ হয়।
আমরা চলি সবাই আপন আপন তাগিদে।
জানি এইটুকু শুধু জীবন ছোট নয়।
আমার বোঝার সীমা ছাড়িয়ে সে বিরাজ করে।
পৃথিবীর' পরে।
অন্যায়ের অনেক তাপ আমার নিঃশ্বাসে,
তবু এমন পাপ করবো না,
জীবনকে ছোট করে দেখবো না।
কারণ প্রত্যেকের জন্যই ভালবাসা—
নিয়ে আসে প্রত্যহ সকালের সূর্য।
শিউলি এখনো ফোটে অজস্র।

সেই নারী

এখনো বর্ষা এলে—

অনেক কথাই মনে পড়ে। কিন্তু

কোনো দিন কোনো বিশেষ নারীকে

কি চিঠি লিখেছি আমি ? বুকের পাঁজর নিঙড়ে নিঙড়ে

কোনো কবিতা ? ঠিক ঠিক। মনেই পড়ে না তা।

যে আমার সামনে থাকে, সে তো এক শরীর—

মানে দেহ।

তাকে নিয়ে ঘর-কন্না করি বটে হাসি কাঁদি।

কিন্তু যাকে পেয়েছি তাকে তো চাই না।

আর যাকে পাই না তারই জন্য অন্তরের যতো আকুতি।

যাকে পাই না তাকেই চাই। এই হয়তো নিয়ম,

আচ্ছা আমরা সবাই সত্যি কথা বলি কি ? সব সময় বলি না।

যদি বুকের গভীরে পাতি কান—

তাহলে শুনতে পাবো

সেখানে এক অসীম শূন্যতায় এক নিঃসঙ্গ বিরহী পায়রা ছট্‌ফট্‌ করছে

আমার রাজকন্যা থাকে সেখানে।

যে প্রতিমাকে আমি গড়ি রাতে দিনে।

মেঘে মেঘে তার শরীরে অনেক অচেনা ফুলের গন্ধ।

সে আমার মানস লক্ষ্মী, আমার কাব্যলক্ষ্মী। আমার প্রেরণা।

আমার সকল চেতনা, আমার সাধনা।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে

নেই অন্য কোনো পথ আর, আমায় অসহায় জেনে,
তোমরা অযথা আমার পিছনে লাগলে
তাই ক্ষ্যাপার মতো ছুটে চলেছি আমি
সাল তারিখ থেকে দ্রাঘিমায়।
যদিও তোমাদের মধ্যে আমি
এবং আমি তোমাদেরও
তবু ঈশ্বরের ঠিক পাদ-পীঠেই
তোমরা প্রোথিত করেছ শয়তানকে,
যেমন পূর্ণিমার চোখের আড়ালে
অমাবস্যার রাহু,
তাই যুদ্ধ দিয়েই আমার অধিকার।
তাই বেছে নিলাম আমার তূণীর
ভরে নিলাম ধারালো যতো হাহাকার,
শান দিলাম খড়্গের মতো ধিক্কার,
তোমাদের মুখোশগুলো উড়িয়ে দিলাম টুপির মতো ঝড়ে,
আর ত্রাণ কার্যের হেলিকপ্টার থেকে
বস্তা বস্তা ছুঁড়ে দিলাম আমার অবিশ্বাস।
অবিশ্বাস আর অশ্রু, অশ্রু আর স্বপ্ন, স্বপ্ন আর ব্যথা,
আকাশ জোড়া মাকড়সার রাশি-চক্রে আমি ক্ষমাহীন।
আমি কান্নাকে দু'হাতে দুমড়ে ধ্বণিত করেছি আমার প্রতিবাদ,
আমি হয়তো বেহায়া, আমি পরাজিত, তবু বীর;
তবু থাকবে আমার স্পর্ধাও। নেই অন্য কোনো পথ আর।

উচ্চারিত এক ধ্বনি

শরৎ আলোর কমল বনে
বাণী, তোমার মনের কোণে
একটু খানি ঠাঁই পাবো বলে—তরু শাখার ফুলে ফলে
অনুক্ষণ আজও চেয়ে থাকি—সকাল বিকাল সন্ধ্যা।
কিন্তু ভালবাসা তো এক অলীক পাখি, খাঁচাব বাইরে,
তাকে কি ধরা যায় ? ছায়াকে তো ধরা যায় না।
এদিকে তোমার প্রতীক্ষায় থেকে স্থবির হলাম—
স্ফূর্তি, শক্তি সব গেল।
এখন লোলচর্ম, তবু আপন কোটরে—
অধীর অপেক্ষায় কম্পমান।
কিন্তু হে নারী অমৃতভাণ্ডও যেমন তোমার হাতে—
বিষভাণ্ডও তেমনি তোমার বুকে—
তোমাকে কে সঠিক চিনতে পারে বলো ?
তবু আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
ব্যথা মোর উঠুক জ্বলে উধ্বর্ পানে।

আলোর প্রার্থনায় পথে বসে আছি

আজ চারিদিকে অসত্যের দাবানল, বিষাক্ত বাতাস,
নির্মল আলো পাবার মিথ্যা আশায় কতো কপাল ঠুকলাম,
কিন্তু হায় আমি আজও মরুভূমি, আমি বন্ধ্যা প্রান্তর,
নিঃসঙ্গ বেদনায় শুধু পথে বসে আছি ভোরের আশ্বাসে।
জানি এ ব্যর্থ নাট্য বারবার অভিনীত—;
কি এক অব্যক্ত অভিমানে তবু এ নিহিত ব্যথা।
হৃদয়ের অন্ধকারে কতো মেঘ, কতো হাহাকার।
তবু এক আলোর নেশা আমাকে যে ডেকে যায় বারবার।
হে পৃথিবী যাহা চাই তাহা পাই না।
এ আমার কি যন্ত্রণা। তুমি বলো না।
তবু সাড়া নেই, দেবতা আমার নির্বাক। দেবতা আমার পাষাণ
শুধু আলোর প্রার্থনা নিয়ে আমি পথে বসে আছি।
আতুর উদাসী, কাঁদে মোর বাঁশি।

আমি কালাপাহাড়

হে ঈশ্বর, জ্ঞান বৃক্ষের ফল কেন দেখিয়ে ছিলে ?
তোমার সৃষ্ট আমিই সেই আদিম আদম,
তোমার কথা উপেক্ষা করে
ঈভের জন্য সেই নিষিদ্ধ ফল আমি খেয়েছি।
তারপর হেন পাপ নেই যা না করেছি, জিজ্ঞাসা করছ
আমার বিবেক ?   স্থবির বৃদ্ধের মতো সে সব দেখে যাচ্ছে।
আর ক্ষমা ?   অনন্ত জীবন ধরে তো তাই
সেই ক্ষমাই তোমার কাছে চেয়ে যাচ্ছি
তবু বলে যাই, আমিই সেই বিশ্বাস ভঙ্গের
প্রথম স্বৈরাচারী পাপ।

আমিই সেই বিস্ফোরণ।
পৃথিবীর সলাজ ঢাকনা খুলে
গোপন গোপনতম জঙ্ঘা উরু স্তন আর অহঙ্কার মূলে
পবিত্র মুখোস নিয়ে উল্লাসে ছিঁড়েছি ফুল ললিত উদ্যানে।
তারপর আমার স্বপ্নের পাহাড় ক্রমে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশে গেছে।
তোমায় পায়ে পড়ি হে ঈশ্বর
এবার আমায় শাস্তি দাও, রক্ষা করো,
অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে নেমে যাবার আগে।
সময় তো চলে গেছে কবে।
তোমার চরণ মূলে ঠাঁই পাবো তবে।

বন্ধু হে—

ভীষ্মের শরশয্যা পেতে আমি তো
বেছেই নিয়েছি এই স্বেচ্ছা নির্বাসন,
আমার এখানে ঘরের ভিতরে ঘর
দেয়ালের ভিতরে দেয়াল,
ঘোলাটে বাতাসে কাঁপে মাকড়সার ঘর-গেরস্থালি।
তবু আমি তো কারো কাছে কোনো
নালিশ করিনি, অভিযোগ করিনি।
তাহলে আমার দরজায় কেন গুপ্তচর আনা?
আমার চারপাশে কেন অনেক মিথ্যা রটনা?
আমাকে অপমান? অসম্মান? এর কোন মানে নেই।
এক দিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিন দিন,
কিন্তু তারপর কি? থেমে যাবে কোলাহল।
আমি দুর্জন, তোমরা না হয় সুজন।
কিন্তু এই মুখ, ওই মুখ, সব মুখ কি সমান নয়?
আমার না হয় কালিতে দাগা ক্ষত এ বুক?
কিন্তু মসীস্নান করোনি কি তোমরা কেউ?
বন্ধু হে, পালাবদল আবার হবে
শুধু নাচের মুখোশটাই পাল্টায়।
আজ আমরা সর্বাত্মক ধ্বংসের সম্মুখীন মানব সভ্যতায়।

আমার জন্মভূমি, আমার মা

কান ঝালাপালা এই শহরে
অনেক শব্দ আর কোলাহল—
অনেক যন্ত্রণা ও হলাহল।
অনেক রক্ত, অনেক ঢং
অনেক দেশী ও বিদেশীর মুখ।
কিন্তু আমার মনে পড়ে একটি গ্রাম
সেখানে বিশেষ করে একটি মুখ—
সে আমার জন্মভূমি,
সে আমার মায়ের মুখ—,
যে আমাকে একটু একটু করে
ভাল বাসতে শিখিয়েছিল—
বৃক্ষলতা গুল্মদের—
এবং কীটপতঙ্গদের।
তাই হে মৃত্যু আমার অনুরোধ—
তুমি আমার ধমনীতে ছেঁদা কোর না এখানে,
আমি শেষ ঘুম ঘুমাতে চাই সেখানে,
বন বনানীতে সবুজ, পাখীর কাকলীতে মুখর যেখানে,
সেই আমার জন্মভূমিতে।
তোমার নিষ্ঠুর হাতে ধরা দেবার আগে—
শেষ বারের মতো দেখে যাব পলাশ—
আর কিংশুক গাছের লাল ফুল,
কেমন কেঁপে ওঠে সেখানে করবীর ডাল উড়ে গেলে বুলবুল।

নদীর ধারে বুনো লতায় পাশে নাচছে ডাহুক ও ডাহুকী-
শেষ বারের মতো ফিরে যাব আমার জন্মের ভোর
সূর্য শরে আহত সেই মাটিতে।
আজ্ কেবলই মনে পড়ে আমার সেই মাটিকে।
আমার জননী জন্মভূমিকে।

অপরাহ্ণের প্রার্থনা

ঠাকুর আমি বাসনাকে, পাপকে বিসর্জন দিতে চাই,
কিন্তু সে কবে? দিনতো ফুরিয়ে এলো।
তাই আমার প্রার্থনা : হে দয়াময়,
নির্মম খড়্গাঘাতে আমার সমস্ত ভান, ক্লৈব্য, ক্লেদ,
আর মানসদীনতা তুমি নিজ হস্তে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।
সে দিন ঘুচবে আমার সকল অহংকার,
তুমি ছাড়া তখন আমার আর কিছু থাক্‌বে না।
পাপ থেকে মরে গিয়ে বাঁচব আমি তখন নতুন করে,
তখন নদী নয়, পাখী নয়, কোনও নম্র ছায়া নয়,
পাপকে বিনাশ করতে আমি সেদিন হয়ে উঠব
রক্ত রণ-মত্ত, দুর্দান্ত নিষ্ঠুর,
বলবো—'জয় তৃষ্ণাতুর'। বলবো জয় 'শাশ্বত যাত্রীর'।

ভোর হবে বিভাবরী

এ সময়ে কেউ কি কোথাও মারা যাচ্ছে ?
তাহলে এসো তার জন্যে আমরা প্রার্থনা করি।
এ সময়ে কেউ কি কারো আত্মাকে খুন করছে ?
তাহলে এসো তার জন্যে আমরা প্রার্থনা করি।
এ সময়ে কেউ কি নতুন করে ভূমিষ্ঠ
হচ্ছে এ পৃথিবীতে ?
তাহলে এসো তার জন্যে আমরা প্রার্থনা করি।
আজ দেশে কোথাও নীতি নেই, সততা নেই,
তবু আমরা এগিয়ে যাবো সামনের দিকে,
কল্যাণের দিকে, মহত্ত্বের দিকে।
দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। দেশ প্রেমে।
তবেই রাত্রি শেষে নতুন সূর্য উঠবে।
ভোর হবে বিভাবরী।

হয়তো কোন একদিন

শারদীয়া সংখ্যার জন্য কবিতা চেয়েছেন,
কিন্তু কোন কবিতাই আমি লিখতে পারলুম না,
শেষে সময়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলুম।
তারপর সময় হাত ধরে নিয়ে গেল আমাকে
এক নদীর কাছে, বলল 'এই তো তোমাদের
আলাপ হয়ে গেল। এবার তবে আমি যাই।'
সময় চলে গেল। তারপর সেই নদী আমাকে
হাত ধরে ধরে নিয়ে গেল এক সমুদ্রের কাছে,
বলল, 'এই তো তোমাদের দেখা হয়ে গেল,
এবার তবে আমি যাই।'
বলেই নদী হাসতে হাসতে সমুদ্রের বুকে
ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সমুদ্র বলল,
'চলো তোমাকে আকাশের কাছে নিয়ে যাই।'
আমি অনন্ত উদার আকাশের দিকে
চেয়ে চেয়ে যে কবিতার শেষ নেই—
তাকে লিখতে চেষ্টা করছি আজও।
হয়তো কোন একদিন পারবো।

আমার জন্মদিনে

এমনি শ্রাবণ দিনে, যোগেন্দ্র নিবাসে,
শ্রাবণ ধারার মাঝে, পৃথিবীকে ভালবেসে
এসেছি এই ধরণীতে পল্লীমায়ের বুকে,
বর্ষাধোয়া মাঠের পথটি ধরে,
পথের ধারে কদম কেশর পড়েছিল ঝরে ,
কেয়ার গন্ধ ছড়িয়েছিল দক্ষিণ জলার মাঠে,
ফুটেছিল কলমীফুল বড় দীঘির ঘাটে ।
চিরকালের বাউল আমি, কণ্ঠে উদাস স্বর,
আপন মনে গান গেয়েছি হৃদয় ভরপুর ।
নিঃসঙ্গ পথিক আমি একতারাটি হাতে,
দাঁড়িয়েছি গাঁয়ের বধুর সিক্ত আঙিনাতে ।
দীন দুখী গরীব যত,
তাদের তরেই মমতা অত,
গাছ-গাছালি আর বনের যত পাখি
তাদের হাতেই বেঁধে দিলাম আমার ভালবাসার রাখি ।
তাদের কথাই মনে পড়ে আজকে শ্রাবণ দিনে,
তারাই আমার মনের মানুষ, মন নিয়েছে কিনে ।
হে ঈশ্বর তোমায় আজি জানাই নমস্কার,
এই বাংলার বুকেই যেন আসি বারংবার ॥

নীলকণ্ঠ পাখী ওড়ে

তুমি কখনো আসবে না জানি,
কাছের থেকে আরো কাছে এসে
কথা বলবে না, কাছে আসবে না
আমার ঘরে ফুলদানির ওপর ঝুঁকে পড়ে
ফুলের পাপড়িগুলি পরীক্ষা করবে না।
তবু আমার সকল গান তো তোমাকেই লক্ষ্য করে।
জানালা দিয়ে অপস্রিয়মান উড়োপাখী,
আমি অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখি,
আমার স্মৃতির মধ্যে তোমার
কবরীর ঝাউ দিনের পরদিন,
হাওয়ার মধ্যে হাওয়া,
যার কোনো মানে নেই,
তবু আজকের এই অনন্ত রাত তো তোমাকেই চায়।
আমার বুকের নরমে ওড়ে নীলকণ্ঠ পাখী।
আমি আশার বিরুদ্ধে
আশা করতে করতে
সেই অসম্ভব স্বপ্নের দিকে
মেলে রাখি আমার অনিদ্রা।
যেখানে বকুল বনের নীচে
কালো চুল মেলে পিঠের প্রান্তরে
তুমি ডেকে এনেছ রাত্রি।
তবু আমি তোমার জন্যেই লিখি আমার কবিতা।
হে সবিতা।

প্রাণ খোঁজে সূর্যের ইশারা

আমাদের সবুজ শস্যক্ষেত্র হয় খরাক্লিষ্ট,
নয় নিমজ্জিত হয় দুর্দৈব বন্যায়,
এর মধ্যে কোথায় বলো সোনালী ফসলের ভরসা ?
কোথায় গভীর প্রত্যাশার স্বপ্ন ?
আমি যতদূরে তাকাই
শুধু ভগ্ন উরু দীর্ণ আশা
যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্তি ।
বন্যার জলে কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে
কচুরিপানার এই নীলবর্ণ বিষফুলে
ভালোবাসা বলো আমি কোথায় খুঁজে পাবো ?
কেমন করে আলোর ঝর্ণায় স্নান করবে এই সবুজ খেত জানি না ;
আমাদের ভাঁড়ারে শুধু শুনি নেই নেই শব্দ,
বালিতে বাঁজা তেপান্তরে কতো তরুণ পথ হারাচ্ছে ।
এর মধ্যে উদ্ভাসিত সূর্যে,
বলো কোথায় পাবো
ভালোবাসায় সুস্থির হবার আশ্বাস,
পাবো বুকের মধ্যে আনন্দের জোয়ার ?
প্রানের মহিমা ছবির রূপের ও রসের ?
তাই প্রান খোঁজে সূর্যের ইশারা ।

জালিকাটা রোদে স্মৃতির কঙ্কন

দুঃখিনী জননী আমার, তুমি দেখিয়েছিলে আমায় স্বর্গের উদ্যান,
আশৈশব সেই বিচিত্র স্বপ্নই দেখেছি আমি। কল্পনায় ছিল
মাটির ঘর, আঙিনায় শীতল পাটির শান্তি—
আম গাছে হলুদকণ্ঠি পাখী ডাকে, জামগাছে নীলকণ্ঠ পাখী।
কিন্তু স্বপ্নটা আর চিরকুটটা তো হারিয়ে গেল যৌবনের ঝড়ে,
কোথায় সেই ছেলেবেলার নদী!
আর কোথায় সেই মেয়েটা, অমিতা যার নাম?
কোথায় যেন থাকে সে আজ নদীর অন্য পাড়ে।
সেখানে পবিত্রতার আর ঠিকানা তার যে জানি না।
এখন পাপ আমার শস্য ক্ষেতে রোজ—
লোনা জল লেলিয়ে দিচ্ছে।
আর বাস্তভিটা তাক করে ছুঁড়ে মারছে
সে যেন দশ হাজার ঘুঘু।
কেননা ওর সংস্পর্শে এলে মদ মেয়েমানুষ আর জুয়ায়
আমি ভণ্ড হয়ে যাই,
ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে যাই।
এখন সামনে আমার মাঘের বন্ধ্যা মাঠ, রুক্ষ শীতল হাওয়া,
কাঠ খড় আর মাটির নগ্নতা। কোথায় মা সেই স্বর্গের উদ্যান?
জালিকাটা রোদে শুধু স্মৃতির কঙ্কন।

আকাশের সাধ এই বনের গহনে

জানতুম তুমি ঘোমটা টানা এক ফুল রজনীগন্ধা,
লজ্জা পাওয়া রাঙিয়ে ওঠা এক সন্ধ্যা
নিতান্ত এক পল্লীগ্রামের মেয়ে।
ধান ভানতে জল আনতে,
অজান্‌তে হয়তো আমার পথ চেয়ে থাকতে।
তাইতো কত দ্বিধা দ্বন্দ্বের নদী পেরিয়ে
আমার তরণী শেষে ভিড়ল এসে তোমার ঘাটে।
তুমি বলেছিলে দাঁড়িয়ে থাকবে
জল আনবার ছলে, কলসী কাঁখে।
এদিকে ঝড়ের তাড়নায় ছিন্ন আমার পাল, ভেঙে গেল হাল
তবু এসেছি ঢেউয়ের মাথায় সাঁতার কেটে কেটে।
ভোরের বেলা আসবো ভেবেছিলাম,
দুর্যোগের দরুণ এলাম তাই গভীর নিস্তব্ধ রাতে।
হয়তো তুমি কুলুপ এঁটে ঘরে, এখন
অভিমানে ঘুমিয়ে আছ নৈরাশ্য নিয়ে বুকে,
কিন্তু এসেছি যখন এতদূরেই, তখন
ফিরবো না আমি, তোমায় ডেকে তুলতেই হবে।
চুম্বন এঁকে দেব সৌরভ ঘন যামিনীতে,
তোমার ছল ছল দু'খানি আঁখির পাতে।
না প্রিয়া কাম নয়, আমি শান্তি চাই,
মৈত্রী চাই, প্রেম চাই, শুভকর্মে নিজেকে জড়াতে চাই।
আমার যে একটুকরো আলো আর আকাশের সাধ।

আমার আমি

প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ থেকে খুঁজেছি
নিজেকে।
কে আমি? কোথা থেকে এসেছি?
কোথায় বা যাবো? পাইনি
এর উত্তর।
বিজ্ঞানীমন জন্মান্তরবাদে
করে না বিশ্বাস।
কৈশোর চঞ্চল খেলায় কেটে গেল।
যৌবনও লেলিহান শিখা নিয়ে
জ্বলে জ্বলে
নিভে গেল এক সময় কখন্।
এখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে
জীর্ণ দেহলীতে বাজে
শেষ প্রহরের ঘণ্টা।
জীবাত্মা মিলতে চাইছে
পরমাত্মার সঙ্গে।
তাই খোঁজাখুঁজির পালা শেষ।
দুজনেরই চোখে জল।

বিনয় বাদল দীনেশের প্রতি

হে বিরাট প্রাণ সব, মুক্ত আত্মার দল, তোমরা দেশপ্রেমিক,
তোমাদের চরণ স্পর্শে একদা ধন্য হয়েছিল পৃথিবীর ধুলি, এই ভারতের মাটি
চারিদিকে আজ অশান্তি আর হাহাকার তারি মাঝে উঠিছে
বিষাদ উঠিছে আকুতি আমাদের হিয়া।
মধুর স্মৃতির গন্ধে ব্যথিত তোমাদের স্বদেশবাসীরা,
তোমরা আজ নাই, কিন্তু তোমাদের ভুলি নাই—মোরা ভুলি নাই।
তোমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাই।

ভালবাসার জন্য

ভালোবাসার জন্যে হিমালয়ের পথে পথে
যাওয়া যায়, কেদার-বদরী,
গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, সর্বত্র যাওয়া যায়,
সাহারা মরুভূমির মধ্যেও হাঁটা যায়,
উত্তরমেরু দক্ষিণ মেরু কোথাও যেতে বাধা নেই।
ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড এই ভালোবাসার জন্য
ছেড়েছেন রাজবাড়ি ও সিংহাসন।
কিন্তু যে সব রোমিওরা আজকাল প্রেমট্রেম
ও পলিটিক্স করে রকের আসরে বসে আর মেয়েছেলে
গোনে, খিস্তিখাস্তা করে, কোনো মেয়ের সঙ্গে
হৃদয় নিয়ে খেলা করে, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে
বেমালুম গা ঢাকা দেয়। আজকের জুলিয়েটরা
জানিনা সেইসব প্রাণ
হন্তারক প্রেমিককে কিবলে? বলে বোধহয় ভালবাসার
স্বাদগুলো সব জ্বলে গেছে শ্মশানের বিদ্যুৎ চুল্লিতে। একালের
রোমিওরা শুধু ড্রাম বাজায় আর শিঙা ফোঁকে।
লম্বা জুলপি রাখে আর মুখ খিস্তি করে।
এরই নাম এদের ভালবাসা।

প্রতীক্ষা

তুমি না হয় ঘুমাও এবার
আমার জাগার পালা
রইবো আমি জেগে।
ধূপ চিরদিন নীরবে জ্বলে যায়
প্রতিদানে সে কি কিছু চায়,
কিছু কি সে পায়? পায় না!
তেমনি আমার না হয় হৃদয় জ্বালা
নিভবে বায়ুবেগে,
আশার মুকুল যাবে ঝরে
হারাবে কালো মেঘে।
তবু তুমি ঘুমাও সুখে, ঘুমাও সুখের নীড়ে
মধুমতীর তীরে, উষ্ণ বালুচরে,
ঝরা বকুলের গন্ধে। সাগর সিন্ধুর স্বপ্নে।
আমি না হয় হাস্নুহানা ফুলের দিকে চেয়ে
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকি।
প্রতীক্ষা—
আর সুরভি; সুরভি আর প্রতীক্ষা।
জানি আকাশে অনেক তারার মালা
হয়তো হারাবে তাও মেঘে।
তবু রইবো আমি জেগে তোমারই প্রতীক্ষায়।
তবু তুমি ঘুমিয়ে থাকো সুখে,
স্বপ্ন নিয়ে চোখে।

ঝুল বারান্দা

ঝুল বারান্দায় ফুলগাছের টবের পাশে তুমি দাঁড়িয়েছিলে,
তোমার মুখে দেবদূতী হাসি।
তোমার পিছনে ছিল সুদীর্ঘ সময়, পিছনে সুদীর্ঘ বেণী।
আর ঘরের মধ্যে যত মৃত পরিবার বর্গের সব ছবি।
তুমি এ যুগের মেয়ে, হায় কত স্বাধীন। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার।
তুমি উল বুনছ কার জন্যে জানি না। সে ভাগ্যবান পুরুষ।
পিয়ন কখন্ আসে ও চলে যায়
তুমি তার খোঁজ রাখো না। তোমায় কি কেউ চিঠি দেয় না?
কখন্ হঠাৎ বেলা শেষ হয়ে যায় তুমি তারও খোঁজ রাখো না।
সারাটা সন্ধ্যা তোমার কাটে গল্পে ও গানে ও বাজনায়।
আনন্দময় সুখের চেতনায়।
কিন্তু আমার বুকের মাঝে নেমে আসে—
ক্রমশ এক বিষন্ন উৎসব। না ব্যর্থ প্রেম নয়
যাকে আমি ভালবাসি সেই প্রকৃতিকে আমি কাছে পাই না।
বিধাতার আশীর্বাদ আমি পাই না।
পঙ্গু আমি কোথাও যেতে পারি না। তাই দুঃখ।
হিংসা হয় তুমি এবার পাহাড়ে বেড়াতে যাবে, তুমি স্বাধীন
এ যুগের মেয়ে।
তুমি ঝুল বারন্দায় সেদিন দাঁড়িয়েছিলে যেন এক ছবি।
বলো তুমি শুধুই কি ছবি? আর কিছু না?

রাম গেছে বনে

দুঃস্বপ্ন দেখে রোজ ঘুম ভেঙে যায়, চারিদিকে সন্ত্রাস ও
খুনজখম, দুর্ঘটনা,
অকারণেই মন খারাপ হয়ে যায়।
তখন জীবনের মানে খুঁজে পাই না, কোথায় সেই আগের
শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ ?
ঠাসবুনোন শহরটা আর ভাল লাগে না। মানুষ কিলবিল করছে।
সকলের মুখে মুখোশ, মিথ্যার মিছিল। ঝোড়ো বর্তমান।
গ্রামের দুরূহ আঁধার লেবুবন মনে পড়ে যায়, সেই নদীর পাড়,
বাতাবি লেবুর বল নিয়ে ছেলেবেলায় খেলতাম।
অন্ধকার শীতের রাত, কপিপাতায় শিশির,
আকাশে নক্ষত্র, মা আলো জ্বালিয়ে রামায়ণ পড়ছেন।
'রাম গেছে বনবাসে।' পরম ক্লান্তিতে আমিও এখন বনে যেতে চাই।
ভীষণ শ্রান্ত বিশ্রাম চাই।
রাম রাজত্ব কবেই শেষ হয়ে গেছে। রাম আর ফিরবে না।
ছেঁড়া ছবিগুলোকে আর জুড়তে পারবো না।

ভারত আমার জন্মভূমি আমার

ভারত সভ্যতার ঐতিহ্য বড় প্রাচীন,
এখানের শহরে গ্রামে দেখি এক অদ্ভুত সৌন্দর্য
আরও দেখি এক বিষন্ন, অবুঝ বেদনার ছাপ,—
এ বিষন্নতা ইতিহাসের বিষন্নতা,
এ বেদনা জীবাত্মার অন্তরে চরাচরের জন্য বিরহ,
বিশ্বজগতের পরম রহস্যের জন্য আকুলতা।
ভাগবদ্‌গীতায় আছে ভগবান বিষ্ণুর মুখ গহ্বর থেকে
উদগীর্ণ হয়েছিল সর্বসংহারী, সর্বশক্তিমান
মহাকালের বহ্নি শিখা। সেই অগ্নিশিখা
সমগ্র পৃথিবীকে একদিকে ভস্ম করে—,
অন্যদিকে তেজে পূর্ণ করে। এই ভারত জানে যে
এই মহাকালের দেবতা ইতিহাসের পথ বেয়ে ধ্বংস
আর সৃষ্টির খেলা একই সঙ্গে খেলে যান।
সেই খেলাই তিনি খেলে চলেছেন দিবারাত্র।
তার মধ্যে দিয়েই শাশ্বত হয়ে জ্বলে ওঠে—
চিরন্তনীর আলোক। সেই আলোই জগতে
তুলে ধরবে আবার আমার ভারত, আমার জন্মভূমি।
আমার সাধের ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ
করবে।

বিকেলের শেষে

এই মন নামক খোলের ভিতর অনেক
গভীর পাতকুয়া আছে।
মানুষ নিজেই তার খবর
রাখে না। লোভ, হিংসা,
পাপাচার, কামার্ততা,
কতো কি? উইপোকা
আর ঘুণ পোকা যেমন
ঢেঁকি ঘরের শাল কাঠের,—
খুঁটি টাই কুরে কুরে খেয়ে
ফেলে, তেমনি করে ঐগুলো
মানুষকে খায়। সময় সময় হঠাৎ সেখান
থেকে বিষ তিরতিরিয়ে ওঠে।
তখন বড় জ্বালা, গরলের জ্বালা,
আগুনের জ্বালা। পৌষ মাসের—
পড়ন্ত বেলায় বড় তাড়াতাড়ি
ক্ষয় ধরে। খেজুর গাছের চেরা
পাতায় অবসাদের ঢল নামে।
উত্তরের হাওয়া হু হু করে বয়।
সেই সঙ্গে হু হু করে ওঠে মন।
কতো তাড়াতাড়িই না জীবনটা
শেষ হয়ে যায়। দেখতে দেখতেই বুঝি ফুরিয়ে এল দিন।

প্রকৃতি প্রেমিক পিতার মেয়েদের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা

তোমাদের বলা রইল—দিবাবসানে, অন্তিম সময়ে
যদি আমার চোখে আর আলো না থাকে,
তবে আকাশের অফুরন্ত প্রবাহ থেকে
আঁজলা করে আলো তুলে নিয়ে
তোমরা আমার মুখে চোখে ছিটিয়ে দিও।
যেন আমার মুখের বলিরেখার ভাঁজে জমা
দীর্ঘদিনের মলিনতা
আর আমার চোখের জমাট বাঁধা অন্ধকার—
সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।
কারণ চিরদিন আমি আলো চেয়েছি, প্রকৃতিকে ভাল বেসেছি।
একটু সবুজ ঘাসের গন্ধ, নদীর জলের গন্ধ, পুকুরের শামুক পানার গন্ধ,
চিরদিন আমায় পাগল করেছে।

শেষ অঙ্কে

একেক দিন অকারণেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।
কারণ নানা ঝামেলা আর ঝক্কি পোয়াতে হয়।
এ বয়সে আর হুল্লোড় ও কাজ ভাল লাগে না।
সব কিছু আমি ভারী ভুলে যাই।
এ বয়সে নিচু হয়ে কিছুই কুড়োতে নেই,
ছুটতে নেই ভিড়ে ভর্তি ট্রাম বাসের পিছনে,
ছুটতে নেই প্রজাপতি আর ফড়িং-এর পিছনে।
আমি ভারি ভুলে যাই। মানে ভুল হয়ে যায়।
ভুলে যাই ভিটামিনের ওষুধগুলি ঠিক সময়ে খাওয়া,
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে রাখা, মিষ্টি না খাওয়া,
মাথা গরম করতে নেই,
ঘি আর দালদা খাওয়া নিষেধ,
দুশ্চিন্তা নিষেধ।
এ বয়সে বসে থাকাই মানায় আমায়।
শুধু বসে বসে ইষ্ট নাম জপ করা।
নিচু হলেই নানা গ্রন্থিস্থলে লাগে।
যারা তরুণ আর তরুণী তারা যত ইচ্ছা ছুটুক,
রমণীয় মৃগয়ায় লুকোচুরি খেলুক,
রাত্রে নগ্নতায় বেহিসেবী হোক।
আমি ভারী ভুলে যাই।
গ্রীষ্মে প্রচণ্ড রোদ থেকে,

বর্ষার ঝম ঝম বৃষ্টি থেকে
শীতের হিমেল হাওয়া থেকে
যৌবনবতী সুন্দরী নারী থেকে
আমার এখন ফেরাই উচিত।
চুপচাপ বসে থাকাই মানায় আমায়।
শুধু বসে বসে ইষ্ট মন্ত্র জপ করা,
কারণ দূরে শেষ তীর্থ ঐ দেখা যায়।

শেষ প্রার্থনা

আমার শৈশবে ছিল পাখি
ফুল ফল গাছ ছায়া আর পাখি। কতোরকমের পাখি।
কৈশোরে ছিল সাথী
স্কুল পড়া খেলা আর সাথী।। কতো রকমের সাথী।
যৌবনে ছিল গান। কতো রকমের গান।
চোখে রঙ্গীন স্বপ্ন নারী আর গান।
এখন প্রৌঢ়ত্বে কেটে গেছে সব তান,
এখন ফুল নেই পাখি নেই,
সাথী নেই, গান নেই,—কিছু নেই আর।
শুধু ধুক ধুক প্রাণ। এখন প্রভু তুমি আলোর বৃষ্টি দাও আমায়।
প্রত্যাশার অপূর্ণতায় কাঁদে আমার হিয়া থরো থরো
হে ঈশ্বর আমায় কিছু ফল দাও। শেষ বয়সে এই প্রার্থনা আমার।
কিছু ফল দাও, আলো দাও।

সূর্যমুখী ভোর চাই

হারজিতের খেলায় শাশ্বতের ঘরে আমি হেরে গেছি,
কতো উৎসব হচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে সমতলে, কতো আনন্দ।
আমার দুঃখী দুপুর-দিঘি শুধু শোকে টলমল করে
আমি এক বোকা যুধিষ্ঠির, দুর্যোধনের কথায় নেচেছি।
এবং পাশা খেলায় সব হেরেছি। যথাসর্বস্ব।
ধনরত্ন রাজ্যপাঠ। ওরা বিনা যুদ্ধে নাহি দেবে সূচগ্র মেদিনী
তাই এখন সম্মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখছি। যুদ্ধ আর ধ্বংস।
ধ্বংস আর অবক্ষয়। ধ্বংস শেষে হে ঈশ্বর।
আবার সাজিয়ে এনো
ভোর,—সূর্যমুখী ভোর,—
তোমার সোনার থালায়।

সময়

সময়—
সে এক বিচিত্র ডাকহরকরা,
দোরে সেঁটে আদালতী কঠিন সমন,
নিখুঁত হিসেব কষে কার কতো জন্মালো ফসল,
কিংবা কার জমি আলস্যে অনাবাদী রয়ে গেছে
মোটেই ফলেনি শস্য, তৃণশূন্য শস্যশূন্য খাঁ খাঁ মাঠ।
অথবা কারো ফসল ফলেছে হায়
কিন্তু মেলেনি তার ন্যায্য দাম, ঠকিয়েছে ধানকল মালিকরা।
অথবা কারো ফসল লুট করে নিয়ে গেছে
রাতের তস্করেরা, হীন দস্যু তারা।
ওই সব লুটেরা অনেক লুটেছে। তাই গৃহস্থরা পথে নেমে এসেছে।
একদা সেই সুখী গৃহীরা আজ নিরন্ন ভিখিরি।
পথে পথে ঘুরে বেড়ায় ফ্যান্ মাগে মৃত্যু পথ যাত্রী।
জানিনা কবে সময়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেবে আবার পশ্চিম বাংলায়
সোনার আলোয় ভরা অলৌকিক এক স্বপ্ন ভবিষ্যত।
কেননা বন্য পশুর চেয়ে হিংস্র এই মানুষের
বিষে যে জ্বলে গেল দেশ।

বসন্তের জোছনায় আমার উদ্যানে

সেদিন তোমার চিঠি এল। রঙীন খামে মোড়া।
তুমি প্রশ্ন করেছ কেমন আছি ?
ভালই তো আছি, যদিও চলতে হাঁটতে পারি না।
তুমি বুঝি তাও জানো না ?
জানো আমার ঘরে নানান বই আছে, লিখিও অনেক।
পোষা পাখি আছে, পালখও রয়েছে ছড়িয়ে
আমার জানালার পাশে বাগান আছে, গাছও আছে।
আমি বসে বসে সে সব দেখি, আকাশ, চাঁদ, তারা।
তুমি বুঝি তা দেখনা।
তুমি রয়েছ বসে নদীর ওপারে, উথাল পাথাল সে নদী।
কিন্তু প্রকৃত তা নদী নয়, অন্য ঘরে, অন্য কোন খানে,
পাচিলের ওপারে তোমার কলকণ্ঠ শুনি।
তোমাকে কি চোখে দেখা যায় ?
না, মাঝখানে বাধার হিমাচল।
তোমাকে কি ছোঁয়া যায় ?
না, তোমার চারিপাশে এক ভূতুড়ে ভয় ছড়িয়ে আছে।
আমি সে ভয় কাটিয়ে উঠতে পারিনা, তাই দূরে দূরে থাকি।
তাই তোমায় স্পর্শ করতে পারিনা। তুমি ধরাছোঁয়ার বাইরে চিরদিন
তুমি আলেয়া।

সেদিন মন্দিরের চাতালে

তোমার ফরসা কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা ছিল
তোমাকে দেখাচ্ছিল উজ্জ্বল পবিত্র একটা ঘৃত প্রদীপের মতো.
মন্দিরের এক কোণে আমিও দাঁড়িয়ে ছিলাম তোমার প্রতীক্ষায়
আমায় দেখে তুমি হাসলে, আবার জাগালে বুকে
আমার সুখ দুঃখ জীবনও ভালবাসা।
আমার মনে হলো ঝাঁক ঝাঁক পায়রা উড়ছে বুঝি আকাশে
ঠাণ্ডা বাতাসে তাদের পাখাগুলো
রোদে ঝিক্‌মিক্ করছে, তাদের পাখনায় রূপোর পালক,
পায়রার ঝাঁক সারা আকাশ তোলপাড় করছে।
আমার বুকের ভিতরটাও।
কদম গাছে শান্ত ঘুঘুটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে
কিন্তু তার ডাক এখনো শোনা যাচ্ছে।
চারিদিকে এত স্বাভাবিক কিন্তু তুমি অদ্ভুত শীতল।
তবু মুখে তোমার দেবদূতী হাসি। কেন এই হাসি ?
তোমার কি মনে পড়ে লতাপাতায় অন্ধকার ভরা সেই দুপুর ?
কি যে মোহময়, ছমছম শরীর,—তারপর ? থাক।
এখন সে সব বাতিল, অলীক স্বপ্ন।
তুমি মন্দিরে পূজা দেবে তাই ফুল কিনছো ফুলকুমারী.
আমি দাঁড়িয়ে ভাবছি তুমি পবিত্র আমি পাপী।
কার পাপ কতোখানি পাপ, কে বলবে
সকলেই কি ছুঁয়ে থাকে এমনি করে শাকম্ভরী ঊরুর চাতাল ?

দ্বিতীয় রিপু

ওহে কেন তুমি এতো রাগ করো ? কার ওপর ?
মিছামিছি শুধু শরীর নষ্ট করা ?
এতো ক্রোধ ভাল নয় । কাম ক্রোধ দুটোই তো ভাল নয় ।
কেন তুমি রাগে পৈতা ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিলে গঙ্গার জলে ?
যা কিছু ঘটনা ঘটছে তোমার আশে পাশে
বলো তা কি তোমার ইচ্ছাধীন ?
তা তো নয় । তা হবার নয় ।
একা তুমি কতোটুকু পারো ? পারো কালোবাজারী বন্ধ করতে ?
আজ মানুষ তার বিবেক হারিয়েছে ।
একশ্রেণীর লোভী মানুষ টাকার পাহাড় জমাচ্ছে অসাধু উপায়ে
তারই ভাইকে তারই দেশবাসীকে বঞ্চিত করে, রিক্ত করে, দরিদ্র করে ।
এতো তুমি পূর্বেও দেখেছ, দেখ নাই ?
ইতিহাসে পড় নাই ?
তবে কেন তুমি ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে ?
রাগে ক্ষিপ্ত হলে ?
গলা থেকে পৈতা ছিঁড়ে ফেলে দিলে গঙ্গার জলে ?
জেনো এতো ক্রোধ ভাল নয় । কাম ক্রোধ দুটোই ভাল নয় ।

ঈশ্বর তুমি কি?

ঈশ্বর তুমি কি শুধুই একটি অনুভূতি?
ভালোবাসার মতো, আনন্দের মতো, অথবা গভীর দুঃখের মতো?
না কি একটি অনুমান?
ঈশ্বর তুমি কি পৌরুষ, আনন্দ স্বরূপ?
তুমি কি সুন্দর, রসময়, মঙ্গলময়?
নাকি নির্বিকার, নিরাসক্ত, নিবিকল্প নির্গুণ?
তুমি কি অন্ধ, বধির, নিষ্ঠুর? চোখে দেখনা, কানে শোনো না?
কি তুমি ঈশ্বর যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না?
যাকে চোখে দেখা যায়না, দেখানো যায় না?
যাকে ভেবে কোনো কূল কিনারা পাই না মনে শুধু সন্দেহের দোলা।
তাই জিজ্ঞাসা করি হে ঈশ্বর তুমি কি?
অনুভূতি না অনুমান?
নিষ্ঠুর না করুণাময়?
আনন্দময় না দুঃখময়?
তুমি কি?

মধ্য বয়সে এসে

ঈশ্বর কাঁটার মুকুট তুমি খুলে নাও। ক্রুশ বহনের
যোগ্য আমি নই। সবাই কি সব পারে ?
আমি চেষ্টা করলেও যীশুখৃষ্ট হতে পারি না।
গান্ধীজীও না। মারটিন লুথার কিংও না।
মধ্যবয়সে এসে এটাই সার বুঝেছি। এখন তাই আফিং ধরেছি।
তাই কিছুতেই আর উত্তেজিত হতে পারি না।
কারা যেন প্রেম করে
কারা যেন নিরন্ন মরে
কারা কাজ করে ঘাড় গুঁজে
কারা কাজ করে না। গল্প করে শুধু ফাঁকি মারে,
কখন মাদার ফুল জ্বলল বা নিভল সবুজে.
এখন নিরুদ্বেগ থাকে মন তাম্বুল চিবোই শুধু চোখ বুজে।
আর কল্পনার নায়ক আমি. নিজের মনে কখনো হারি কখনো জিতি,
একলাই বসে বসে ধৈর্য ধৈর্য খেলি।

শেষের কবিতা

অপ্রকাশিত

শোন গৌরী, অনেক রক্ত ঝরেছে আমার বুকের মধ্যে,
হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলেছি আমি তোমার মতো অনেক মেয়ের জন্যে,
সেই রক্ত অঞ্জলি ভরে দেবো আমি আজ ভালবাসার দেবতার পায়ে,
সেই আমার কবিতা আমার শেষের কবিতা।
আমি একালের এক অখ্যাত কবি।
একটু রঙ বুলিয়ে দেবো মেঘে,
একটু গন্ধ এনে দেবো একটি ফুলে,
একটু হাসি ফুটিয়ে তুলবো একটি দুঃখী জীবনে,
একটু সেবা করবো একটি আতুরকে, সাহায্য করবো একটি দুঃস্থকে।
সেই আমার প্রার্থনা সেই আমার শেষের কবিতা।
শোন গৌরী, আমি কবি, সাধারণের,
আমার কথা তো কোনো একজনের কথা নয়,
এ হল সাধারণ মানুষের কথা।
তাদের হাসিকান্না, তাদের সুখদুঃখের কথা,
যারা তোমার কাছে অজানা অচেনা,
জীবনের মূল্য যারা কোথাও পায়না,
যাদের জন্য কাঁদবার কেউ নেই,
যারা রিক্ত নিঃস্ব ও সর্বহারার দল
তাদের জন্যেই আমার চোখের জল,
তাদের জন্যেই আমার এই লেখা,
সেই হল আমার কবিতা, আমার শেষের কবিতা।
আমি কবি এই হল আমার পরিচয়,

আমি ভালবাসি নারীকে প্রকৃতিকে,
আমি ভালবাসি জীবনকে, মানুষকে
সেই হল আমার কবিতা।
আমার শেষের কবিতা ॥

পৃথিবীর সমাজকে সংসারকে পিছনে রেখে

কবির ডায়েরি থেকে

জানি বেনাবন আর বাঁশের আড়ালে
গোপন পায়ে মৌন তুমি
আসবে নেমে ঘাসে,
সমাধি হয়ে কবর হয়ে
নরম মাটি মেখে, আমার জীবন শেষে।
পলাশ শিমূল পাতার সাথে মিতালি পাতিয়ে
সব সমস্যার অঙ্ক শেষে একটি শেষ নিঃশ্বাসে
ক্লান্তি ফেলে জিরোবে তুমি হে আমার দেহ মন
আকাশে চোখ রেখে।
সমাধি হয়ে, কবর হয়ে, নরম মাটি মেখে।
বলবে ছোট ছোট ঘাসের শীষ
তোমার গালের কাছে নুয়ে,
'ক্লান্তি ফেলে জিরাও তুমি
আকাশে চোখ রেখে,
আকাশ তলে হাওয়ার হাটে
ঘাসের মাঠে শুয়ে। ঘুমাও পরম সুখে
সমাজকে আর সংসারকে পিছনে ফেলে রেখে।'
তখন ঘুমাবো আমি সুখে।

আলোটা এখন নিভিয়ে দাও

কবির ডায়েরি থেকে

আমার দুয়ার থেকে একটু দূরে গেলেই গহীন গাঙে উন্মোচিত ঢেউ
প্রেক্ষাপটে অনচ্ছ মুখগুলি সিন্ধুজলে কঠিন বিষণ্ণতা।
তোমরা বলেছিলে, 'একটু এগিয়ে যাও, সামনে আছে নদী।'
সেই থেকে তো হাঁটছি। হাঁটছি নিরবধি। ভাবছি বুঝি সামনে আছে নদী।
মাঠের পরে মাঠ পেরুল, বনের পরে বন।
কিন্তু কোথায় সেই নদী? তাই বিদ্রোহী এ মন।
নিষ্প্রদীপ মহেঞ্জোদারোতে চারিধারের অন্ধকারেতে
আমি এখন এক প্রসারিত অশত্থ স্তব্ধ, জেগে আছি।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলে আবার জ্বেলে দিও সহস্র আলো।
এখন মাথার ওপর আকাশটায়
শান দিচ্ছে ঝড় বিদ্যুৎ অন্ধ রাগে।

হে মহাকাল

আমরা বিগত, তোমরা বর্তমান,
তোমরা নবীন, আজকের মানুষ,
তোমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি,
তাই নবীন কালকে স্বাগত জানাই ।
মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া আর কালোটাকা
একালের ইহলোকে মানুষের এই কাম্য ।
পরলোক তারা মানে না ।
মানি সুন্দর উপভোগ্য তোমাদের কয়েকটি দিন
কিন্তু বিত্ত খাদ্য ও নারীর দ্বারা জীবন তো ধন্য হয় না,
তাই বুকে বেদনা অনুভব করি ।
জানি যিনি সব করাচ্ছেন, তিনিই সব করছেন, তিনিই সব করবেন
তিনি মালিক, তিনি মহাকাল ।
খণ্ডকালেরা তাঁর ভৈরব ।
তিনি বলেন 'এটা ভাঙো ।'
তারা তাই শোনে, ভাঙে ।
তিনি বলেন 'নতুন গড়ো ।'
তারা নতুন সৃষ্টি করে ।
পুরানো পৃথিবী বদলায় ।
পৃথিবী আবার নতুন করে সাজে ।
হে মহাকাল, তোমায় নমস্কার ।

সেই কবে থেকে

সেই কবে থেকে আমি
একপা একপা করে হেঁটে চলেছি, ইতিহাসের পথে
ফাহুয়েং, হিউয়েন সাঙকে সঙ্গে করে নিয়ে
হাজার হাজার বছর ধরে পথ হাঁটছি।
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা,
শ্রাবস্তী নগরে, অশোক বিম্বিসারের রাজ্যে,
আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে,
কতোদিন কতোকাল। হৃদয়ে আকাঙ্খার নদী,
নিঃসঙ্গ বুকের গানে, ধানক্ষেতে মাঠে,
চারিপাশে বনের বিস্ময় মেখে
ফলন্ত ধানের গন্ধ বুকে নিয়ে
অনেকদিন হাঁটলাম। কতো যুগ কতো কাল।
এখন আমি ক্লান্ত প্রাণ এক,
সবশেষে নিঃসীম ব্যর্থতা, গ্লানি আর গ্লানি।
ফুরায়েছে এ জীবনের সব লেনদেন।
আর নয় উল্কার মতো এই শক্তিক্ষয়।
রাত্রির শেষ প্রহরে কিছু অন্ধকার
কিছু আলো
বন্ধুগণ এবার বিদায়।
সাম্য প্রতিষ্ঠায় হাতে হাত দাও। গণতন্ত্র আমরা চাই।
তারপর আমি অজানার খোঁজে বহুদূরে আবার চলে যাই।

নরক শ্মশান হলো সব

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উন্মত্ত লালসায়
ঘুরেঘুরে আমরা কেবলই নামছি।
নামছি আর নামছি। পাতালে একেবারে।
এক পা দুপা করে গাঢ় অন্ধকারে,
আমিও অতি লোভে পথ হারিয়ে ফেলেছি,
এখন যত দূরেই চাই দেখি কালো শুধু অন্ধকার।
দেখছি মাঠ জুড়ে থম থম করছে ভয়
ঘাসের ডগাগুলো কাঁপছে
আর কোথায় যেন ঝটপট করছে
দিকভ্রান্ত নিশাচর পাখিদের ডানা।
ঝোপেঝাড়ে জোনাকিরা দল পাকিয়ে
উড়োজাহাজের আলোর সঙ্কেতের মত
অন্ধকারে শুধু জ্বলছে আর নিভছে। জ্বলছে আর নিবছে
এমন সময় কানের কাছে মুখ এনে কে যেন
ফিসফিস করে আমাকে বলল
'দেখেছ অন্ধকার, ঠিক যেন কালো বারুদের মত,
তোমার দেশলাইটা একবার দাও তো।
আমি আলো জ্বালাই। তুমিও জ্বালাও।'
কিন্তু অতি মুনাফার লোভ কাটিয়ে, কাম ক্রোধ জয় করে
পৃথিবীতে আলো জ্বালাতে আর আমরা পারবো কি?

আশা

কবির ডায়েরি থেকে

বলেছি তো অনেকবার কেন শোননি বকুল ?
এখনো কুড়োতে চাও তুমি যত রাজ্যের ফুল ?
কেন কাকে দেবে ? বিনিময়ে কি পাবে ?
তুমি যা কিছুই কুড়াও দু হাতে,
যা কিছুই ভরে তোল আঁচলে,
জেনো বঞ্চনার ক্ষোভ তুমি পাবে । সবই এখানে ফেলে
যেতে হবে । এ জগতে মিলবে না সুখ, চারিদিকেই দুঃখ ।
পালক বিহীন দুপেয়ে জীবদের ছোবল তুমি খাবে ।
আমিও বার বার তা খেয়েছি ।
দেখ আমিও তো বসে আছি বহুকাল
        শব্দহীন বৃক্ষের স্বভাবে,
রোদের কণিকা ক্রমে পান করে,
প্রতিটি যৌবন থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পুষ্পিত প্রণয়,
বেঁচে আছি বুকে নিয়ে
        চৈতন্যের দীপ্র বরাভয় ।
তবু সব সময় মনে হয় কি জানি কি হয় ।
        যদিও জানি আশা ছলনাময় !

নদীর সময়

অপ্রকাশিত

দেবতা আমার, কোনো প্রার্থনা ছাড়াই তুমি একদিন সব দিয়েছিলে
মেদ মাংস হাড় সুন্দর করে সাজিয়ে, আরও দিয়েছিলে
আমার উদ্ধত যৌবন, রমণীর শরীরের উত্তাপ,
আর মন্দিরের চূড়ায় ও মিনারে পাখিদের গান।
হাটু মুড়ে তোমায় অভ্যর্থনা জানালাম
সেদিন হে আমার ঈশ্বর।
তারপর দিন গুনে গুনে আবার একে একে
কেড়ে নিলে সব,
আমার মহার্ঘ রত্নরাজি।
নষ্ট শরীরে পড়ে আছে এখন শুধু হাড়ের কাঠামো,
একদিন পরাক্রান্ত সম্রাট,—
আজ পথের ভিখারী। ধূলায় আসন পেতেছি।
প্রতিদিন ছায়া নামে দুঃখময় রক্তের গভীরে,
সময়ের উজানে আমি আজ একা, এক বিধ্বস্ত নায়ক,
এক রাজ্যপাট হারা পরাজিত সম্রাট।
নদীর উজান বেয়ে সময় শুধু চলে যায়।
স্মৃতি শুধু রেখে যায়। যায়, যায় চলে যায়।

[জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে রচনা]

ভিখিরি

অপ্রকাশিত

পশ্চিম বাংলার দেড়কোটি মানুষ আজ
অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে।
চারিধারে শুনি দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।
আমরা আজ ভিখিরি।
আমার ছেলে বলে আমরা একদিন
আবার বড়লোক হবো।
আমিও একদিন ওই রকম ভেবেছিলাম,
হবে গাড়ি বাড়ি ফোন ফ্যান ফ্রিজ সিনেমা।
মনে পড়ে আমিও একদিন ওই ভিখিরিদের
সঙ্গে বসে সমানভাবে ভাগ করে
খেয়েছি অন্ন। আর আজও তাই আছি।
দুর্নীতি করে কালো টাকার পাহাড় জমাতে পারিনি।
কার্পেট ও দামী পর্দা, ঝকমকে ড্রইংরুম,
ঠোঁটে আলতো লিপস্টিক মসৃন মহিলা,
আমার কাছে আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে।
আমাদের সোনার বাংলায় কি আবার সোনা ফলবে ?
অমানিশার রাত্রি শেষে আবার সূর্যোদয় হবে কি ?
কে জানে যেন তাই হয়।
ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে যেন সামাজিক পরিবর্তন আসে।
গরীব যেন সুবিচার পায়।

লাল সূর্যের টিপ

অপ্রকাশিত

হে নারী, তোমার মুখের শুধু একদিকে আলো,
সেদিকে গোলাপের মিষ্টি গন্ধে চিরকালের সুর।
তোমার মুখের অন্যদিকে অন্ধকার,
সেখানে সাগর নদী সব এক। কিছুই দেখি না।
তিমিরে স্পন্দিত সেই নির্বাপিত নক্ষত্রে কি আছে?
কিছু উত্তাপ? কোনো প্রলোভন?
তুমি কি তা জানো? জানো না। পুরুষ তা জানে
এখন পৃথিবীময় শুধু অবক্ষয় আর অভিশাপ।
হে নারী তুমি কি নদীর শব্দে আমাকেই ডেকেছিলে
কোনো দিন সেই দূরতম সৌরলোক থেকে?
তাই সমস্ত বাধা পার হয়ে
তবুও আমাকে তোমার কাছে—
ফিরে আসতে হয় বারবার।
ওই দেখ আকাশে লাল সূর্যের টিপ।
ওই শোন ফেরিঘাটে সম্মিলিত প্রার্থনা।
এর মধ্যে আমার প্রার্থনা শুনতে পাবে কি?
আমার প্রার্থনা ঘরও যেমন তোমার প্রয়োজন
বাহিরও তোমার তেমনি প্রয়োজন।
নারীবর্ষে এই আমার প্রার্থনা।

ক্লান্তি

অপ্রকাশিত

আলোর ছায়া দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে,
এখন ক্লান্তি এসে ঘিরেছে আমাকে ধরে,
কি হবে বলো শীতের ফুল তুষারে কুড়িয়ে
স্বপ্ন কুড়িয়ে ?
কি হবে বলো শীতের ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে
স্বপ্ন উড়িয়ে ?
তোমার আমার প্রেম সবইতো গোধূলি
কেন তবে মৃত্যু থেকে তুলি ?
এখন আর কি হবে জ্বালিয়ে রেখে আকাশের তারা,
স্মৃতির পাহারা ?
তুমি ছাড়া সব মিথ্যা এই পৃথিবীতে
পৌষের এই শীতে
সে চেতনা কতটুকু পারে আজ শান্তি দিতে ?
মহাকাল সব নিতে নিতে
যতটুকু ফেলে গেছে সে রাতের নিভৃতে
সে আমার একান্ত অমরা।
সেই ক্লান্তি যেচে এসে এখন হয়েছে স্বয়ম্বরা।
তুমি গেছ চলে
যত মোম দিনে বসে জ্বালিয়েছি একে একে সব গেছে জ্বলে
এখন স্মৃতির পাতা শুধু ঝরে পড়ে দলে দলে।

সাদা জোছনা

হে ঈশ্বর,—আমিতো কতোবার চেয়েছি
জনশূন্য—খোলা প্রান্তরের মাঝখানে—
অন্ততঃ একবার গিয়ে দাঁড়াতে।
পাখিদের মিষ্টি গান শুনতে—
হে দয়াময়, আমি তো কতবার চেয়েছি
আমার সমস্ত অভাবের দীনতাকে ভাসিয়ে দিয়ে
অন্ততঃ একবারও জোছনা প্লাবিত মাঠের মাঝখানে—
দাড়িয়ে গান গাইতে—
তোমায় প্রাণভরে ডাকতে—
কিন্তু কই, কোথায় তুমি দিলে সেই আনন্দময় জীবন ?
রোগশয্যায় গৃহবন্দী আমি কোথায় সেই অপার সৌন্দর্য
এই নোংরা কোলাহলময় শহরে ?
যেখানে জোছনা থাকে চোখের অনেক দূরে!
পাখিরা উড়ে যায় দূরে বহু দূরে।